

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রবিউল হাসান

রোলঃ 23100110426

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রবিউল হাসান

রোলঃ 23100110426

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: রবিউল হাসান, আইডিঃ 23100110426 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মো: রবিউল হাসান

তারিখঃ

আইডিঃ 23100110426

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....	6
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও বিষয়ের গুরুত্ব.....	6
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য :.....	6
১.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review).....	8
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology).....	11
অধ্যায় ২: জিহাদের আভিধানিক ও শরীয়ী সংজ্ঞা.....	14
২.১ ভাষাগত বা আভিধানিক অর্থ.....	14
২.২ শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের প্রায়োগিক রূপ.....	14
অধ্যায় ৩: আল-কুরআনে জিহাদের ধারণা.....	15
৩.১ মক্কী যুগের আয়াত ও আত্মিক সংগ্রাম.....	15
৩.২ মাদানী যুগের আয়াত ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা.....	16
অধ্যায় ৪: আল-হাদিসে জিহাদের গুরুত্ব ও বর্ণনা.....	18
অধ্যায় ৫: জিহাদের প্রকারভেদ.....	21
৫.১ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (আত্মসংযম) :.....	21
৫.২ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ.....	24
৫.৩ দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ.....	26
৫.৪ সশস্ত্র জিহাদ (শর্তসাপেক্ষ).....	29
অধ্যায় ৬: সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা.....	32
৬.১ সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার অপরিহার্য শর্তাবলী (Prerequisites).....	32
৬.২ যুদ্ধকালীন মানবিক নীতিমালা ও আচরণবিধি (Ethics of Warfare).....	33
৬.৩ প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা (Prohibition of Scorched Earth Policy) :.....	34
৬.৪ মৃতদেহের বিকৃতি (Mutilation) এবং বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ :.....	34
অধ্যায় ৭: জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অপব্যখ্যা.....	36

৭.১ জিহাদ = সন্ত্রাসবাদ (ভুল ধারণার খণ্ডন)	36
৭.২ জোরপূর্বক ধর্ম প্রচারের অভিযোগ	36
অধ্যায় ৮: আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রায়োগিক রূপ :	37
৮.১ শিক্ষা অর্জন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ:	37
৮.২ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো (সামাজিক প্রতিরোধ):	37
৮.৩ সমাজ সংস্কার (Ethical and Structural Reform):	37
অধ্যায় ৯: উপসংহার ও সুপারিশমালা	38
৯.১ উপসংহার :	38
৯.২ সুপারিশমালা :	38
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (References) :	38

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও বিষয়ের গুরুত্ব

ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে 'জিহাদ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বহুমাত্রিক এবং কেন্দ্রীয় ধারণা। তবে আধুনিক বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মিডিয়া ডিসকোর্স এবং চরমপন্থী ধারণার উত্থানের ফলে এই শব্দটির মূল চেতনা ও প্রায়োগিক রূপটি চরমভাবে বিতর্কিত এবং ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে 'জিহাদ' শব্দটিকে প্রায়শই সহিংসতা, অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই গবেষণার মূল গুরুত্ব নিহিত রয়েছে ইসলামের মূল আকর গ্রন্থ—আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং ধ্রুপদী ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে জিহাদের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করার মধ্যে। বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং ইসলাম সম্পর্কে তৈরি হওয়া পদ্ধতিগত ভুল ধারণা (Islamophobia) দূর করতে এই বিষয়ে একটি নিরাসক্ত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং তাত্ত্বিক গবেষণা অত্যন্ত জরুরি।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য :

ক. প্রধান উদ্দেশ্য (Primary Objective)

- 'জিহাদ' সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা ও ইসলামোফোবিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক খণ্ডন করে এর প্রকৃত অর্থ, প্রকারভেদ এবং উদ্দেশ্য (ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা) বিশ্বমঞ্চে ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে স্পষ্ট করা।

খ. বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives)

❖ জিহাদের কোরআনিক ও হাদিসভিত্তিক রূপরেখা বিশ্লেষণ:

সূরা আল-ফুরকান (২৫:৫২), সূরা আন-নাহল (১৬:১২৫) এবং সূরা আত-তাওবার (৯:১২২) মতো আয়াতগুলোর আলোকে দাওয়াহ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানভিত্তিক জিহাদের গুরুত্ব প্রমাণ করা।

❖ সশস্ত্র জিহাদের শর্তসমূহ স্পষ্টকরণ:

কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ করা যে, সশস্ত্র জিহাদ কেবল আত্মরক্ষা এবং জুলুমের বিরুদ্ধে একটি শর্তসাপেক্ষ ব্যবস্থা, যা কেবল রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে এবং যেখানে নিরপরাধ মানুষ বা প্রকৃতি ধ্বংস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

❖ আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের পুনর্ব্যাখ্যা:

বর্তমান ডিজিটাল ও বিশ্বায়নের যুগে উচ্চশিক্ষা অর্জন, সমাজ সংস্কার, নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক প্রচারকে কীভাবে ‘জিহাদ’ হিসেবে গণ্য করা যায়, তার একটি সমকালীন রূপরেখা তৈরি করা।

❖ উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ:

তথাকথিত চরমপন্থী দলগুলোর ভ্রান্ত ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও অপকৌশলগুলোকে চিহ্নিত করে যুবসমাজকে উগ্রপন্থা থেকে দূরে রাখার জন্য একটি তাত্ত্বিক গাইডলাইন প্রদান করা।

❖ সমস্যা চিহ্নিতকরণ :

বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ‘জিহাদ’ শব্দটি সবচেয়ে বেশি ভুল ব্যাখ্যা এবং অপপ্রচারের শিকার। এই গবেষণার মূল সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

● ধারণাগত বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার (Conceptual Misconception):

আধুনিক বিশ্বে ‘ইসলামোফোবিয়া’ এবং মিডিয়া প্রোপাগান্ডার কারণে ‘জিহাদ’ শব্দটিকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ বা ‘উগ্রপন্থা’র সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ অমুসলিম এবং অনেক মুসলিম যুবকের মনেও জিহাদের প্রকৃত রূপ নিয়ে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

● ভারসাম্যের অভাব (Lack of Balance):

জিহাদ নিয়ে সমাজে দুটি চরমপন্থী ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল (উগ্রপন্থী গোষ্ঠী) জিহাদের নামে আত্মঘাতী হামলা ও নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে, যা ইসলামের যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। অন্যদল, পশ্চিমা সমালোচকদের ভয়ে জিহাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার বা আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চায়।

● অহিংস জিহাদের অবমূল্যায়ন:

ইসলামে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (জিহাদ বিন-নফস), দাওয়াহ, জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে জিহাদকে (জিহাদে কবীর) যেখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সমকালীন

আলোচনায় সেগুলোকে আড়াল করে কেবল ‘সশস্ত্র যুদ্ধ’ বা কিতালকে (Kital) হাইলাইট করা হচ্ছে।

- **সশস্ত্র জিহাদের অপব্যাখ্যা:**

একটি বৈধ ইসলামিক রাষ্ট্র কাঠামো এবং আমির বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শর্ত ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রবণতা উম্মাহর মধ্যে ফিতনাই ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

১.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

‘জিহাদ’ ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক ও বহুল আলোচিত পরিভাষা। সমকালীন ও শাস্ত্রীয় সাহিত্যে জিহাদের সংজ্ঞা, পরিধি এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এই সাহিত্য পর্যালোচনায় বিদ্যমান গবেষণাসমূহকে মূলত তিনটি প্রধান ধারায় বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হলো:

ক.চিরায়ত ও শাস্ত্রীয় ইসলামী সাহিত্য (Classical Islamic Literature)

শাস্ত্রীয় যুগের ফিকহ ও তাফসীর গ্রন্থে জিহাদকে একটি সামগ্রিক এবং বহুমাত্রিক ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- **সামগ্রিক সংগ্রাম:**

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে জিহাদের চারটি প্রধান স্তর উল্লেখ করেছেন: নফসের (কুপ্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন মুমিনের জন্য নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আত্মিক সংগ্রামই হলো সব জিহাদের ভিত্তি।

- **জ্ঞান ও দাওয়াহর অগ্রাধিকার:**

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এবং পরবর্তীতে সমকালীন মুফাসসিরগণ সূরা আল-ফুরকানের (২৫:৫২) ব্যাখ্যায় কলম, যুক্তি ও দাওয়াহর মাধ্যমে পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামকে ‘জিহাদে কবীর’ বা মহা জিহাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

- **যুদ্ধনীতি ও বিধিনিষেধ:**

ক্লাসিক্যাল ফিকহের কিতাবসমূহে (যেমন: হেদায়া বা বাদায়েউস সানায়ে) সশস্ত্র জিহাদ বা 'কিতাল' (Kital)-এর কঠোর শর্তাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধ কেবল একটি বৈধ ইসলামী রাষ্ট্রের আমিরের অধীনে এবং আত্মরক্ষার্থে বা দীন প্রচারের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হলে শর্তসাপেক্ষে বৈধ, যেখানে অসামরিক ব্যক্তি হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

খ. আধুনিক ও সমকালীন ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য (Modern Islamic Literature)

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক আইন এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোকে জিহাদের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন।

● প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ (Defensive Jihad):

আধুনিক স্কলার যেমন ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ফিকহুল জিহাদ' (*The Jurisprudence of Jihad*)-এ প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামে যুদ্ধের মূল কারণ 'কুফর' (অবিশ্বাস) নয়, বরং 'উদওয়ান' (আগ্রাসন ও জুলুম)। অর্থাৎ, কেউ অমুসলিম হলেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, বরং সে মুসলমানদের ওপর চড়াও হলেই কেবল যুদ্ধ বৈধ।

● জ্ঞানভিত্তিক ও ডিজিটাল জিহাদ:

বর্তমান যুগের চিন্তাবিদগণ (যেমন: ড. জাকির নায়েক বা প্রফেসর ড. তারিক রামাদান) দেখিয়েছেন যে, আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যে 'ইসলামোফোবিয়া' ছড়ানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য, বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে দাঁড়ানোই এই যুগের সবচেয়ে বড় দাওয়াহ ও জ্ঞানভিত্তিক জিহাদ।

গ. পশ্চিমা ও প্রাচ্যবিদদের সাহিত্য (Western and Orientalist Literature)

পশ্চিমা সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জিহাদ শব্দটিকে সবচেয়ে বেশি একপেশেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

● একপেশে মূল্যায়ন ও ইসলামোফোবিয়া:

এডওয়ার্ড সাইদ তাঁর বিখ্যাত 'অরিয়েন্টালিজম' এবং 'কভারিং ইসলাম' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে পশ্চিমা মিডিয়া ও অ্যাকাডেমিয়া 'জিহাদ' শব্দটিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনে ইসলামের প্রতি ভয় (Islamophobia) তৈরি করেছে। পশ্চিমা সাহিত্যে প্রায়শই জিহাদকে 'পবিত্র যুদ্ধ'

(Holy War) হিসেবে অনুবাদ করা হয়, যা মূলত ক্রুসেডের ধারণা থেকে ধার করা এবং যা জিহাদের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে।

● উগ্রপন্থার উত্থান:

অনেক পশ্চিমা গবেষক (যেমন: ব্রুস হফম্যান বা পিটার বার্গেন) আল-কায়েদা বা আইসিসের (ISIS) মতো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর কর্মকাণ্ডের আলোকে জিহাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে জন এস্পোসিটোর (John L. Esposito) মতো আধুনিক পশ্চিমা গবেষকরা তাদের ‘*What Everyone Needs to Know About Islam*’ গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, উগ্রপন্থীদের এই সহিংসতা ইসলামের মূলধারার জিহাদ নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং একটি অপব্যখ্যা।

ঘ.গবেষণার ঘাটতি (Research Gap)

পূর্ববর্তী সাহিত্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঘাটতি বা সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা গেছে:

১. অধিকাংশ পশ্চিমা সাহিত্যে জিহাদের আধ্যাত্মিক (নফসের বিরুদ্ধে) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক (জ্ঞান ও দাওয়াহ) দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবল ‘সশস্ত্র যুদ্ধ’কে হাইলাইট করা হয়েছে।
২. অপরদিকে, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর লিটারেচারে ফিকহের কঠোর শর্তসমূহ (যেমন: রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা) অমান্য করে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে জিহাদের অপব্যখ্যা করা হয়েছে।
৩. সমকালীন বাংলা সাহিত্যে একাডেমিক ও গবেষণামূলক আঙ্গিকে—কুরআন-সুন্নাহর মূল উৎস বজায় রেখে কীভাবে আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সমাজ সংস্কারকে ‘জিহাদের ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা’র সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, তার একটি সমন্বিত রূপরেখার অভাব রয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো ইসলামের মৌলিক উৎস এবং সমকালীন বাস্তবতার আলোকে 'জিহাদ'-এর প্রকৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপরেখা বিশ্লেষণ করা। গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগত কাঠামো (Methodological Framework) অনুসরণ করা হয়েছে:

১. গবেষণার ধরণ (Type of Research)

এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)। যেহেতু এখানে কোনো গাণিতিক বা পরিসংখ্যানগত উপাত্ত (Statistical Data) বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, বরং ধারণাগত স্পষ্টতা, ধর্মীয় টেক্সটের ব্যাখ্যা এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা মূল উদ্দেশ্য, তাই গুণগত পদ্ধতিই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এর পাশাপাশি এটি একটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক (Descriptive and Analytical) গবেষণা।

২. তথ্যের উৎসসমূহ (Sources of Data)

গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে তথ্য ও উপাত্তসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে সংগ্রহ করা হয়েছে:

ক. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):

ইসলামের মূল এবং বিশুদ্ধ উৎসসমূহ থেকে সরাসরি তথ্য নেওয়া হয়েছে:

- আল-কুরআন:

জিহাদ, দাওয়াহ, জ্ঞানার্জন এবং যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত মূল আয়াতসমূহ (যেমন: সূরা আল-ফুরকান: ৫২, সূরা আন-নাহল: ১২৫, সূরা আত-তাওবা: ১২২)।

- আল-হাদিস:

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি ইত্যাদি প্রধান হাদিস গ্রন্থ থেকে জিহাদের প্রকারভেদ ও শর্ত সম্পর্কিত সহীহ হাদিসসমূহ।

- শাস্ত্রীয় ফিকহ ও তাফসীর:

ইমাম ইবনুল কায়্যিম, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এবং অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামদের ধ্রুপদী ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

খ. মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources):

সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য আধুনিক উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে:

- আধুনিক ইসলামী স্কলারদের গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ (যেমন: ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর ‘ফিকহুল জিহাদ’)।
- পিয়ার-রিভিউড জার্নাল (Peer-reviewed Journals), একাডেমিক নিবন্ধ এবং থিসিস পেপার।
- আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের সনদ (যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা সম্পর্কিত) এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন (ইসলামোফোবিয়া ও উগ্রপন্থা বিশ্লেষণের জন্য)।

৩. তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Data Analysis Method)

সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য প্রধানত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে:

- পাঠ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ (Textual and Content Analysis):

কুরআন ও হাদিসের সংশ্লিষ্ট টেক্সট বা পাঠ্যকে তার শানে নুযুল (নাজিলের প্রেক্ষাপট) ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে কোনো আয়াতের খণ্ডিত বা ভুল ব্যাখ্যা তৈরি না হয়।

- তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis):

ইসলামের প্রকৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ জিহাদ নীতির সাথে বর্তমান যুগের ‘উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসী’ কর্মকাণ্ডের এবং পশ্চিমা ‘ইসলামোফোবিক’ ধারণার একটি তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিকীকরণ (Contextualization):

শাস্ত্রীয় যুগের জিহাদ এবং যুদ্ধনীতিকে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ডিজিটাল মিডিয়া এবং বৈশ্বিক শান্তির প্রেক্ষাপটে পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা (Scope and Scope of Limitations)

- পরিধি:

এই গবেষণাটি মূলত জিহাদের আধ্যাত্মিক (নফসের বিরুদ্ধে), বুদ্ধিবৃত্তিক (দাওয়াহ ও জ্ঞান) এবং প্রতিরক্ষামূলক সশস্ত্র রূপের শর্তাবলীর তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

- **সীমাবদ্ধতা:**

সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং মাঠপর্যায়ের জরিপ (Field Survey) না করার কারণে এটি সম্পূর্ণ লাইব্রেরি-ভিত্তিক বা ডকুমেন্টারি গবেষণার ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রাথমিক উৎসের শক্তিশালী ব্যবহারের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. নৈতিক বিবেচনা (Ethical Considerations)

ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে গবেষণায় চরম পক্ষপাতহীনতা ও সততা বজায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি তথ্য, আয়াত এবং হাদিসের ক্ষেত্রে মূল সূত্রের (Citation & References) সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চুরি বা প্লাজিয়ারিজম (Plagiarism) না ঘটে।

অধ্যায় ২: জিহাদের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা

২.১ ভাষাগত বা আভিধানিক অর্থ

'জিহাদ' (جهاد) শব্দটি আরবি মূল ধাতু 'জুহদ' (جُهِدَ) বা 'জাহদ' (جَاهَدَ) থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো:

- কোনো কঠিন কাজে সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো।
- পরিশ্রম করা, কষ্ট স্বীকার করা এবং কোনো লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা।

লিসানুল আরব (لسان العرب) গ্রন্থে ইবনে মনজুর উল্লেখ করেছেন যে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়েও নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত প্রয়োগ করাই হলো ভাষাগত অর্থে জিহাদ। অর্থাৎ, এটি কেবল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেকোনো সং-উদ্দেশ্যে মানুষের সর্বোচ্চ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২.২ শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের প্রায়োগিক রূপ

ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, দ্বীনের হেফাজত ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জান, মাল, জবান ও কলম দ্বারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করাকে জিহাদ বলে।

ফক্বীহ বা আইনবিদদের পরিভাষায় জিহাদের অর্থ আরও সুনির্দিষ্ট। ইমাম ইবনে রুশদ তাঁর *বিদায়াতুল মুজতাহিদ* গ্রন্থে এবং হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ *আল-হিদায়া*-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করাই হলো জিহাদ। তবে ফিকহের কিতাবগুলোতে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভেদে জিহাদের হুকুম (ফরজে আইন বা ফরজে কিফায়া) নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অধ্যায় ৩: আল-কুরআনে জিহাদের ধারণা

আল-কুরআনে জিহাদ এবং এর সমার্থক শব্দসমূহ (যেমন: কেতাল বা যুদ্ধ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে জিহাদের বিবর্তনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

৩.১ মক্কী যুগের আয়াত ও আত্মিক সংগ্রাম

মক্কী জীবনে (নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর) মুসলমানদের সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো অনুমতি ছিল না। এই যুগে জিহাদের মূল অর্থ ছিল ধৈর্য (সবর), দাওয়াত এবং নিজের ঈমানকে রক্ষা করার আত্মিক সংগ্রাম।

فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে এক মহা সংগ্রাম (জিহাদান কাবির) চালিয়ে যান।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২)

আয়াতটির প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব:

- মক্কী যুগের আয়াত:

এই আয়াতটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কী যুগে মুসলমানদের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতাল (অস্ত্র হাতে লড়াই) করার অনুমতি ছিল না। তখন জিহাদ বলতে ছিল ধৈর্য ধারণ করা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া এবং কুরআনের অকাটা যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে সত্যকে তুলে ধরা।

- জিহাদে কবীর (মহা জিহাদ):

আয়াতে ব্যবহৃত 'জিহাদান কাবীকা' বা মহা জিহাদ বলতে মূলত 'কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ'-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তলোয়ার বা অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, বরং কুরআনের জ্ঞান, যুক্তি, দর্শন, সুন্দর আচরণ এবং দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করার যে প্রচেষ্টা, তাকেই আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

- আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

থিসিস-এ যে 'দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ' এবং 'শিক্ষা অর্জন ও সমাজ সংস্কার'-এর কথা বলা হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় দলিল হলো এই আয়াতটি। বর্তমান সমকালীন বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ভুল ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চলছে, তার জবাব অস্ত্র দিয়ে নয়, বরং এই আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞান ও কুরআনের অকাট্য যুক্তি (জিহাদে কবীর) দিয়েই দেওয়া সম্ভব।

৩.২ মাদানী যুগের আয়াত ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, যখন মুসলমানরা বহিঃশত্রু এবং মক্কার কুরাইশদের দ্বারা পদ্ধতিগতভাবে আক্রান্ত হচ্ছিলেন, তখন প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের বা যুদ্ধের (কেতাল) অনুমতি দেওয়া হয়।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯)

আয়াতটির প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব:

- প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি:

মক্কার দীর্ঘ ১৩ বছর কাফেরদের চরম অত্যাচার, নির্যাতন ও সামাজিক বয়কট সত্ত্বেও মুসলমানদের হাত তোলার বা প্রতিআঘাত করার অনুমতি ছিল না। তারা মদীনায হিজরত করার পর, যখন কাফেররা সেখানেও মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রথম আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

- অনুমতির মূল কারণ (জুলুম ও নির্যাতন):

আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— "কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে"। অর্থাৎ, ইসলামে যুদ্ধ কোনো শখ বা আগ্রাসনের বিষয় নয়। যখন কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর সীমাহীন জুলুম করা হয়, তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের

অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, কেবল তখনই অস্ত্রের মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

- "যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষায়" নীতির সমর্থন:

খিসিস-এ সশস্ত্র জিহাদের যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, "যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষায়", এই আয়াতটি তার অকাট্য প্রমাণ। ইসলামে আক্রমণাত্মক বা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং অন্যায়ের শিকার মজলুমদের আত্মরক্ষা ও অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যই এই বিধান দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৪: আল-হাদিসে জিহাদের গুরুত্ব ও বর্ণনা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কর্ম (হাদিস) জিহাদের ধারণাকে আরও সুনির্দিষ্ট ও বিন্যস্ত করেছে। সিহাহ সিতাহর (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি) প্রতিটি প্রধান গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়্যার' (জিহাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যায়) নামে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। একটি বিখ্যাত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিহাদের আধ্যাত্মিক দিকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ. قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: جِهَادُ

النَّفْسِ

"আমরা ছোট জিহাদ (জিহাদে আসগর) থেকে বড় জিহাদের (জিহাদে আকবর) দিকে ফিরে এলাম।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! বড় জিহাদ কোনটি?" তিনি বললেন, "নফসের বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।" (বায়হাকী)

যদিও এই হাদিসটির সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে, তবে এর অন্তর্নিহিত বার্তাটি আল-কুরআনের মূল চেতনার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও স্পষ্ট করেছেন যে, সর্বোত্তম জিহাদ হলো একজন অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা (আবু দাউদ, তিরমিজি)। নিচে এই হাদিসটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আধুনিক সমকালীন বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

a. জিহাদের ধারণার ব্যাপকতা (অস্ত্রের বাইরেও জিহাদ)

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, জিহাদ মানেই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে লড়াই করা। কিন্তু এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে জিহাদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অস্ত্র ছাড়াও কেবল "মুখের কথা" বা "সত্য উচ্চারণের" মাধ্যমেও যে জিহাদের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব, রাসুলুল্লাহ (সা.) তা এখানে স্পষ্ট করেছেন। এটি মূলত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম।

b. এটিকে কেন 'সর্বোত্তম জিহাদ' বলা হয়েছে?

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক যখন লড়াই করে, তখন তার পেছনে একটি বাহিনী থাকে, তার হাতে অস্ত্র থাকে এবং জয়ের বা বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একজন নিঃসঙ্গ মানুষ যখন কোনো শক্তিশালী অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তার অন্যায়ের

প্রতিবাদ করে, তখন তার কাছে কোনো অস্ত্র থাকে না। সেখানে তাৎক্ষণিক বন্দিত্ব, নির্যাতন বা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি থাকে শতভাগ।

নিজের জীবনকে চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে কেবল সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে এই যে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন—এ কারণেই একে 'আফদালুল জিহাদ' বা সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।

c. ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও সমাজ সংস্কার

'সমাজ সংস্কার'-এর যে কথা বলা হয়েছে, তার মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই হাদিসের দর্শনে। ইসলাম সমাজ থেকে জুলুম ও দুর্নীতি দূর করতে চায়। আর সমাজের জুলুম তখনই বন্ধ হয়, যখন শাসকের ভুল বা অন্যায়ের গঠনমূলক সমালোচনা করার পরিবেশ থাকে। এই হাদিসটি মুসলিম সমাজকে শিখিয়েছে:

- ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।
- ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে অত্যাচারীর তোষামোদি (চাটুকারিতা) করা যাবে না।
- মজলুমের পক্ষে এবং ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে।

d. সমকালীন বিশ্বে এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ

বর্তমান আধুনিক প্রেক্ষাপটে এই হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম:

● বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকার:

আধুনিক বিশ্বে মানুষ বাকস্বাধীনতা (Freedom of Speech) ও মানবাধিকারের জন্য লড়াই করেছে। অথচ ইসলাম ১৪০০ বছর আগেই স্বৈরাচারী শক্তির সামনে সত্য বলার অধিকারকে শুধু স্বীকৃতিই দেয়নি, বরং একে সর্বোচ্চ ইবাদত বা 'সেরা জিহাদ' ঘোষণা করেছে।

● মিডিয়া ও কলমের জিহাদ:

বর্তমান যুগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা কেবল মুখের বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা, লেখালেখি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করাও এই 'কলমে আদল' বা সত্য বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

সারসংক্ষেপ:

"জিহাদ মানে সন্ত্রাসবাদ নয়, বরং এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা যার মূল উদ্দেশ্য ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা"— এই হাদিসটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। ইসলাম

তলোয়ারের চেয়ে সত্যের শক্তিকে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধকে বেশি
প্রাধান্য দেয়।

অধ্যায় ৫: জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- a. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ
- b. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ
- c. দাওয়াহ ও জ্ঞান জিহাদ
- d. সশস্ত্র জিহাদ (শর্তসাপেক্ষ)

৫.১ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (আত্মসংযম) :

খিসিস-এ ‘জিহাদের প্রকারভেদ’-এর সর্বপ্রধান পয়েন্ট হলো "a. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (আত্মসংযম)"।

ইসলামে নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, লোভ, হিংসা ও অন্যায়ের তাড়নাকে দমন করে নিজেকে আল্লাহর অনুগত রাখার এই সংগ্রামকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদিসের আলোকে 'নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ' বা আত্মসংযমের গুরুত্ব নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং আত্মশুদ্ধি (তায়কিয়াহ) অর্জন করার ব্যাপারে সরাসরি তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

● আত্মসংযমই জান্নাতের চাবিকাঠি:

সূরা আন-নাযিয়াত-এ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, যারা নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তাদের ঠিকানাই জান্নাত:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজের নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসন।" (সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯:৪০-৪১)

● নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহর বিশেষ পথপ্রদর্শন:

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা নিজেদের ভেতরের ও বাইরের সব রকমের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা (জিহাদ) করে, আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দেখান:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّ الْمُصْحِنِينَ
 "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় (জিহাদ করে), আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"
 (সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯)

মুফাসসিরগণের মতে, এখানে 'আমার পথে জিহাদ' বলতে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও বোঝানো হয়েছে।

● সফলতার মূল শর্ত নফসকে পরিশুদ্ধ করা:

সূরা আশ-শামস-এ আল্লাহ তাআলা মানুষের নফসের শপথ করে বলেছেন:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
 "শপথ নফসের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন... যে ব্যক্তি নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে-ই সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নিজের নফসকে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।" (সূরা আশ-শামস, ৯১:৭-১০)

● নফসের মন্দ স্বভাব:

কুরআনে নফসের একটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে 'নফসে আন্মারা' (মন্দ কর্মে প্ররোচনাকারী নফস) বলা হয়। মানুষের এই স্বভাবের বিরুদ্ধে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
 "নিশ্চয়ই মানুষের নফস মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ দিয়ে থাকে, কেবল সে ছাড়া যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।" (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩)

খ. হাদিস শরীফের আলোকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন হাদিসে সাহাবিদেরকে স্পষ্ট করে শিখিয়েছেন যে, প্রকৃত বীর বা প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই, যে নিজের নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

● প্রকৃত মুজাহিদের সংজ্ঞা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে মুজাহিদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে বলেন:

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

অনুবাদ: "আর প্রকৃত মুজাহিদ তো সে-ই, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে নিজের

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (সংগ্রাম) করে।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি, ইবনে হিব্বান - হাদিসটি সহীহ)

● প্রকৃত বীর কে?

শারীরিক শক্তি দিয়ে কাউকে হারিয়ে দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বড় কোনো বাহাদুরি নয়, বরং নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা বা নফসকে দমন করাই আসল বীরত্ব: "ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী বা বীর নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে রাগের মাথায় নিজের নফসকে (নিজেকে) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

● নফসের তাড়না থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আশ্রয় প্রার্থনা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সবসময় বিভিন্ন খুতবায় এবং দোয়াতে নফসের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন, যা প্রমাণ করে এই সংগ্রাম কতটা কঠিন:
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
অনুবাদ: "এবং আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফসের (ভেতরের) যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ মুসলিম, খুতবাতুল হাজাহ-এর অংশ)

সমকালীন বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা (Conclusion) :

বর্তমান ভোগবাদী বিশ্বে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বা আত্মসংযম অত্যন্ত জরুরি। আজকের দিনে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতার যুগে নিজের চোখ, কান, মন এবং চরিত্রকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রাত্যহিক লড়াই—তা-ই হলো সবচেয়ে বড় নফসের জিহাদ। ইসলাম এই আত্মিক সংশোধনকে আগে প্রাধান্য দেয়, কারণ যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে না, সে কখনো সমাজে বা পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

৫.৬ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

শয়তান মানুষকে প্রতিনিয়ত পাপের দিকে প্ররোচিত করে এবং অন্তরে কুখারণা (ওয়াসওয়াসা) সৃষ্টি করে। শয়তানের এই আধ্যাত্মিক ও মানসিক আক্রমণকে প্রতিহত করা, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখা এবং ইবাদতে অবিচল থাকাই হলো এই প্রকারের জিহাদ।

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধংদেহী মনোভাব বা সতর্কবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

● শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ:

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে শয়তানের বিরুদ্ধে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জিহাদ বা শত্রুতার ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ
"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো
তার অনুসারীদেরকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী
হয়।" (সূরা ফাতির, ৩৫:৬)

● শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা:

শয়তান সরাসরি মানুষকে বড় পাপে লিপ্ত করে না, বরং সে ছোট ছোট সুক্ষ্ম পদক্ষেপের (Steps) মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তাই কুরআনে বারবার সতর্ক করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের
পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তবে শয়তান তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ
দেবে।" (সূরা আন-নূর, ২৪:২১)

● শয়তানের ফাঁদ দুর্বল:

মুমিনদের অভয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, তাদের সামনে শয়তানের চক্রান্ত টিকতে পারে না:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا
 "সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৭৬)

খ. হাদিস শরীফের আলোকে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) শয়তানের আক্রমণের সুক্ষ পথগুলো উন্মোচন করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কীভাবে আত্মরক্ষা বা জিহাদ করতে হবে তা শিখিয়েছেন।

● রক্তের ধারায় শয়তানের চলাচল:

শয়তান মানুষের কত কাছে থেকে আক্রমণ করে তা বোঝাতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্ত চলাচলের শিরায় শিরায় বিচরণ করে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) তাৎপর্যযেহেতু সে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে কুপ্ররোচনা দেয়, তাই তার বিরুদ্ধে জিহাদটি বাহ্যিক তলোয়ার দিয়ে নয়, বরং সার্বক্ষণিক আত্মিক সচেতনতা এবং আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে করতে হয়।*

● শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের ঢাল (জিকির ও ইস্তিগফার):

রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের কৌশল শিখিয়েছেন:

"আল্লাহ ইয়াহইয়া (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন... তিনি যেন বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর জিকির করার নির্দেশ দেন। এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যার পেছনে শত্রু দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে, আর সে একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। ঠিক তেমনি বান্দা আল্লাহর জিকির ছাড়া শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।" (جامع الترمذي - তিরমিজি, হাদিসটি সহীহ)

● শয়তানের কুপ্ররোচনা প্রতিরোধের দোয়া:

যখনই মনের মধ্যে কোনো কুচিন্তা বা অন্যায়ের ইচ্ছা জাগে, তখনই শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে (আউযুবিল্লাহ পড়তে) রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, যা সূরা আল-আ'রাফের ২০০ নম্বর আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের দুটি প্রধান ক্ষেত্র (ইমাম ইবনুল কায়্যিম-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী):

ইসলামী স্কলারদের মতে, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ মূলত দুটি ফ্রন্টে বা ক্ষেত্রে হয়ে থাকে:

১. সন্দেহ দূরীকরণের জিহাদ (جهاد الشبهات):

শয়তান মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলাম ও আখেরাত নিয়ে নানাবিধ সন্দেহ বা সংশয় তৈরি করতে চায়। এর বিরুদ্ধে সঠিক জ্ঞান ও সঠিক আকিদা অর্জনের মাধ্যমে জিহাদ করতে হয়।

২. কামনা-বাসনা প্রতিরোধের জিহাদ (جهاد الشهوات):

শয়তান মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও হারামের দিকে প্ররোচিত করে। এর বিরুদ্ধে ধৈর্য (সবর) ও আত্মসংযমের মাধ্যমে জিহাদ করতে হয়।

সমকালীন বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা (Conclusion) :

মূল মেসেজ— "জিহাদ একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা"—এর সাথে এটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমকালীন বিশ্বে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা নানাবিধ বিভ্রান্তি, অশ্লীলতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মূল উসকানিদাতা হলো শয়তান। তাই এই যুগে শয়তানের পাতা ফাঁদ (যেমন: পর্নোগ্রাফি, সুদ, মাদক, হিংসা-বিদ্বেষ) চিনে তা থেকে নিজেকে দূরে রাখার যে মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, তা-ই হলো সমকালীন প্রেক্ষাপটে শয়তানের বিরুদ্ধে প্রকৃত জিহাদ।

৫.৮ দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ

ইসলামের সত্য ও সুমহান বাণী মানুষের কাছে যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া। আধুনিক যুগে মিডিয়া, লেখালেখি, গবেষণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার দূর করা এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান যুগে রক্তপাত বা অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়েও জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সুন্দর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার সংগ্রামই হলো ইসলাম প্রচারের মূল চালিকাশক্তি। নিচে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই বিষয়ের বিস্তারিত রূপরেখা ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো:

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে অস্ত্রের লড়াইয়ের চেয়ে জ্ঞান অর্জন এবং সুন্দর উপায়ে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংগ্রামকে বড় জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

● কুরআনের সাহায্যে মহা জিহাদ (জিহাদে কবীর):

মক্কী যুগে যখন মুসলমানদের অস্ত্র ধারণের অনুমতি ছিল না, তখন আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের ভ্রান্ত মতবাদের জবাব দিতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি এই কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে এক মহা জিহাদ (জিহাদে কবীর) পরিচালনা করুন।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২)

এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআনের যুক্তি, দর্শন ও জ্ঞান দিয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভুল ধারণা দূর করার আন্দোলনই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ।

● হিকমাহ বা প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াতের নির্দেশ:

ইসলাম প্রচারের মূল নীতি হলো জোর-জবরদস্তি নয়, বরং জ্ঞান ও সুন্দর আচরণ:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"আপনি আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমাহ (প্রজ্ঞা/জ্ঞান) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫)

● জ্ঞান অর্জন ও সমাজ সংস্কারের জন্য দল গঠন:

যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে সমাজ সংস্কার করার গুরুত্ব কতটা বেশি, তা সূরা আত-তাওবার এই আয়াতে স্পষ্ট:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"আর মুমিনদের সবার একসাথে (যুদ্ধে) বের হওয়া সংগত নয়। তবে তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফেকাহ) অর্জন করতে পারে এবং তাদের কওম যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা বেঁচে চলে?" (সূরা আত-তাওবা, ৯:১২২)

খ. হাদিস শরীফের আলোকে দাওয়াহ ও জ্ঞানের সংগ্রাম

রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ জ্ঞান চর্চা এবং দাওয়াতের কাজকে ইবাদতের সর্বোচ্চ শিখর এবং অন্যতম সেরা জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছেন।

● সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ:

অস্ত্রের লড়াইয়ের চেয়েও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান নেওয়াকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বোত্তম জিহাদ বলেছেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
 "সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী (জালিম) শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত বা সত্য কথা বলা।" (আবু দাউদ, তিরমিজি)

● দাওয়াহর মাধ্যমে একজনের হিদায়াত দুনিয়ার সব সম্পদের চেয়ে উত্তম:

রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারের যুদ্ধের দিন আলী (রা.)-কে বলেছিলেন:

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ
 "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন মানুষকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট (সে আমলের সবচেয়ে দামী সম্পদ) পাওয়ার চেয়েও উত্তম।" (সহীহ বুখারী)

● জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মর্যাদা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান অর্জনের পথকে জান্নাতের পথের সাথে তুলনা করে বলেছেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
 "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।" (সহীহ মুসলিম)

* সমকালীন বিশ্বে 'দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ'-এর প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান আধুনিক যুগে এই জিহাদের রূপগুলো নিম্নরূপ:

● ইসলামোফোবিয়া ও অপপ্রচারের জবাব :

বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যে তীব্র অপপ্রচার চালানো হচ্ছে (যেমন: ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ছড়ায়, নারীদের অধিকার দেয় না ইত্যাদি), তার জবাব কখনো অস্ত্র বা সহিংসতা দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এর একমাত্র সমাধান

হলো— গভীর জ্ঞান অর্জন করে আধুনিক যুক্তি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বমঞ্চে ইসলামের প্রকৃত সুন্দর রূপটি তুলে ধরা।

- **প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াহ (ডিজিটাল জিহাদ):**

আজকের যুগে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, বই-পুস্তক, ব্লগ, ভিডিও এবং পডকাস্টের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে সহীহ আকীদা ও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এই যুগে জ্ঞান দ্বারা জিহাদের অন্যতম বড় মাধ্যম।

- **শিক্ষা অর্জন ও সমাজ সংস্কার:**

আপনার ফাইলের রূপরেখায় যেমনটি বলা হয়েছে— *"শিক্ষা অর্জন ও জিহাদ"*। একজন মুসলিম যখন সততার সাথে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, অর্থনীতিতে বা শান্তিশাস্ত্রে অবদান রাখে, তখন সে প্রকারান্তরে বিশ্ব দরবারে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখে।

সারসংক্ষেপ:

সমকালীন বিশ্বে তলোয়ার বা অস্ত্রের জিহাদের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত এবং তা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ প্রতিটি মুসলিমের জন্য সার্বক্ষণিক এবং উন্মুক্ত, যার মূল লক্ষ্য যুদ্ধ নয়—বরং মানুষের অন্ধকার মনকে সত্যের আলোয় আলোকিত করা।

৫.৮ সশস্ত্র জিহাদ (শর্তসাপেক্ষ)

যখন রাষ্ট্র বা সমাজ কোনো চরম আত্মসন, ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ বা গণহত্যার মুখোমুখি হয়, তখন জানমাল রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করা। তবে এই জিহাদ কখনোই অনিয়ন্ত্রিত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়, বরং তা কঠোরভাবে রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তসাপেক্ষ।

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে সশস্ত্র জিহাদ ও এর শর্তসমূহ :

পবিত্র কুরআনে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ এবং কঠোর কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

- **প্রথম শর্ত: শুধুমাত্র আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ (Self-Defense):**

ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে যে আয়াতটি নাজিল হয়, সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তারা মজলুম বলেই কেবল এই অনুমতি দেওয়া হলো:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
 "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯)

● দ্বিতীয় শর্ত: সীমালঙ্ঘন না করা এবং কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই:

যুদ্ধক্ষেত্রেও মুসলিমদের জন্য কঠোর সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
 "আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯০)

অর্থাৎ, যারা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাদের ওপর হাত তোলা স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন এবং ইসলামে হারাম।

● তৃতীয় শর্ত: শত্রু শান্তির প্রস্তাব দিলে যুদ্ধ বন্ধ করা:

শত্রু যদি যুদ্ধাবস্থা থেকে ফিরে আসতে চায়, তবে মুসলমানদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 "আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬১)

খ. হাদিস শরীফের আলোকে সশস্ত্র জিহাদের কঠোর আচরণবিধি :

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধের জন্য বাহিনী পাঠাতেন, তখন মুজাহিদদের জন্য এমন কিছু মানবিক ও কঠোর নৈতিক নিয়ম বেঁধে দিতেন, যা আধুনিক যুদ্ধ আইনেও বিরল।

● নিরপরাধ ও অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা নিষিদ্ধকরণ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু ও দুর্বলদের সুরক্ষার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলতেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ:

"اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا كَبِيرًا فَانِيًّا، وَلَا مُنْعَزِلًا بِصَوْمَعَةٍ" "তোমরা আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো... তবে কোনো নবজাতক শিশু, নারী এবং অতি বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করো না।" (সুনানে আবু দাউদ, সহীহ মুসলিম)

● প্রকৃতি ও উপাসনালয় ধ্বংস না করার নির্দেশ:

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো যুদ্ধনীতির আলোকেই বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন:

"তোমরা কোনো ফলবান বৃক্ষ কেটো না, কোনো শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দিও না, কোনো গবাদিপশু হত্যা করো না (খাবারের প্রয়োজন ছাড়া) এবং গির্জা বা উপাসনালয়ে রত সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের কোনো ক্ষতি করো না।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

অধ্যায় ৬: সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা

ইসলাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর এবং মানবিক আন্তর্জাতিক আইন (International Humanitarian Law) প্রবর্তন করেছে, যা আধুনিক জেনেভা কনভেনশনের চেয়েও অনেক প্রাচীন ও সুসংহত। ইসলামি আইনশাস্ত্র (ফিকহ) এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (International Humanitarian Law) আলোকে সশস্ত্র জিহাদের মূল শর্ত ও নীতিমালাসমূহ নিচে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

a. সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার অপরিহার্য শর্তাবলী (Prerequisites)

ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা কোনো অরাজ্যীয় গোপন গোষ্ঠীর (Non-state actors) খেয়াল-খুশিমতো সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করা ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ। এর জন্য প্রধানত তিনটি মৌলিক শর্ত পূরণ হতে হয়:

● বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (Sovereign Authority):

ধ্রুপদী ফিকহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার একচ্ছত্র অধিকার কেবল একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের (আল-ইমাম বা আল-সুলতান)। ইমাম আল-কাসানী তাঁর *বাদায়েউস সানায়ে* গ্রন্থে লিখেছেন, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য (ফিতনা) সৃষ্টি করে, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

● আগ্রাসন বা চরম জুলুমের উপস্থিতি (Presence of Aggression):

ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন মুসলমানরা সামরিক আক্রমণ, পদ্ধতিগত জাতিগত নিধন বা ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের শিকার হয়। সূরা আল-হাজ্জ-এর ৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে।"*

● শান্তিপূর্ণ সমস্ত বিকল্পের ব্যর্থতা (Failure of Diplomacy):

যুদ্ধ শুরুর আগে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা, কূটনৈতিক সমঝোতা বা আন্তর্জাতিক চুক্তির সমস্ত শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম সুযোগ থাকলেও যুদ্ধ পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

b. যুদ্ধকালীন মানবিক নীতিমালা ও আচরণবিধি (Ethics of Warfare)

ইসলাম যুদ্ধের মতো চরম পরিস্থিতিতেও চরম মানবিকতা ও নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা আধুনিক জেনেভা কনভেনশনের চেয়েও অনেক প্রাচীন ও সুসংহত।

যুদ্ধকালীন নীতিমালা :

- বেসামরিক নাগরিক
- ধর্মীয় ব্যক্তি
- প্রাকৃতিক সম্পদ
- মৃতদেহের সম্মান
- সুরক্ষা নীতি
- উপাসনালয় রক্ষা
- পরিবেশ রক্ষা
- চুক্তি রক্ষা

ক. বেসামরিক বা অ-যোদ্ধা নাগরিকদের সুরক্ষা (Principle of Distinction) :

সুনানে আবু দাউদের ২৬১৪ নম্বর হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট সামরিক নির্দেশ দিয়েছিলেন:

"তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধযাত্রা করো... তবে কোনো নবজাতক শিশু, নারী এবং অতি বৃদ্ধ (অক্ষম) মানুষকে হত্যা করো না।"

এই নির্দেশনা অনুযায়ী, যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি (Non-combatants) যেমন—নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক বা সাধারণ নাগরিক, তাদের জীবন ও সম্পদ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ হারাম (কবিরা গুনাহ)।

খ. ধর্মীয় ব্যক্তি ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তা :

যুদ্ধে অমুসলিমদের উপাসনালয় (গির্জা, মন্দির, সিনাগগ) ধ্বংস করা এবং সেখানে অবস্থানরত পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদের হত্যা বা হেনস্তা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জীবনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা (Prohibition of Scorched Earth Policy) :

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়া অভিযানের সময় সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: "কোনো ফলবান বৃক্ষ কেটো না, কোনো শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দিও না, কোনো গবাদি পশু অহেতুক জবাই করবে না এবং জনবসতি ধ্বংস করবে না।" যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বিষাক্ত উপাদান দিয়ে পানির উৎস দূষিত করা বা গণবিধ্বংসী উপায়ে পরিবেশের ক্ষতি করা ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ।

ঘ. মৃতদেহের বিকৃতি (Mutilation) এবং বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ :

যুদ্ধে নিহত শত্রুপক্ষের মৃতদেহের নাক, কান কাটা বা বিকৃতি ঘটানো (লা তামছুলু) এবং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করা নিষিদ্ধ। একইভাবে, আন্তর্জাতিক বা দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি বা যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গ করা (লা তাগদিরু) জঘন্যতম অপরাধ।

c. আত্মরক্ষামূলক (Defensive) বনাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ :

আধুনিক মুসলিম আইনবিদদের (যেমন: ইবনে তাইমিয়াহ, ড. ওয়াহবা আল-জুহাইলী) মতে, ইসলামে যুদ্ধের মূল ভিত্তি হলো আত্মরক্ষা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। কাফের বা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধের কারণ তাদের 'কুফর' বা ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং তাদের 'হারব' বা সামরিক আগ্রাসন।

সূরা আল-বাকারার ১৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

اَللّٰهُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَغْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ اِلَّا رِ۫ىۤ اَوْ قَاتِلُوْا فِيْ سَبۜبٍ
"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে কোনো সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যদি শত্রুপক্ষ কোনো এক পর্যায়ে যুদ্ধ থামিয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। যেমনটি সূরা আল-আনফালের ৬১ নম্বর

আয়াতে বলা হয়েছে: "আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ুন।"

সারসংক্ষেপ:

বর্তমান যুগের চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো (যেমন: আইসিস বা আল-কায়েদা) সাধারণ জনগণের ওপর যে আত্মঘাতী বা নির্বিচার হামলা চালায়, তা ইসলামের এই সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় শর্ত ও যুদ্ধকালীন মানবিক নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামি আইন অনুযায়ী এই ধরনের কর্মকাণ্ড 'জিহাদ' নয়, বরং তা 'ফ্যাসাদ ফিল আরদ' (পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি) বা যুদ্ধাপরাধের শামিল।

অধ্যায় ৭: জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অপব্যাখ্যা

৭.১ জিহাদ = সন্ত্রাসবাদ (ভুল ধারণার খণ্ডন)

সমকালীন বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি হলো জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদকে (Terrorism) এক করে দেখা। সন্ত্রাসবাদের মূল লক্ষ্য হলো নিরপরাধ সাধারণ মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করা, যার কোনো আইনি বা নৈতিক ভিত্তি নেই।

পক্ষান্তরে, জিহাদ হলো অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে একটি সুশৃঙ্খল, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসম্মত সংগ্রাম। ইসলামে আত্মঘাতী হামলা, জনাকীর্ণ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ বা বেসামরিক জিম্মি হত্যাকে 'জিহাদ' নয়, বরং 'ফ্যাসাদ ফিল আরদ' (পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি) হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কবির গুনাহ।

৭.২ জোরপূর্বক ধর্ম প্রচারের অভিযোগ

অনেকে মনে করেন ইসলাম তরবারির জোরে বা জোরপূর্বক ধর্ম চাপানোর জন্য জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে। এই ধারণাটি কুরআনের অকাট্য বাণীর পরিপন্থী:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৬)

ঐতিহাসিকভাবে, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা (জিম্মি) সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল।

অধ্যায় ৮: আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রায়োগিক রূপ :

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে গ্লোবাইজেশন এবং তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জিহাদের বাহ্যিক রূপ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এর তিনটি মূল ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

৮.১ শিক্ষা অর্জন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ:

সমকালীন বিশ্বে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জ্ঞান (Knowledge Economy)। মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা দূর করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সমাজবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করা এবং সেই জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করা এই যুগের অন্যতম প্রধান জিহাদ।

৮.২ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো (সামাজিক প্রতিরোধ):

সমাজে প্রচলিত দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে জবান ও কলমের মাধ্যমে সোচ্চার হওয়া নাগরিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

৮.৩ সমাজ সংস্কার (Ethical and Structural Reform):

দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করা আধুনিক জিহাদের জীবন্ত উদাহরণ।

অধ্যায় ৯: উপসংহার ও সুপারিশমালা

৯.১ উপসংহার :

সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ কোনো ধ্বংসাত্মক বা উগ্রবাদী ধারণা নয়। এটি একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে 'ন্যায়' (Justice), 'শান্তি' (Peace) প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি (Pleasure of Allah) অর্জন করা। সশস্ত্র জিহাদ কেবল তখনই বৈধ হয় যখন শান্তি ও ন্যায়বিচারের সমস্ত শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তা কঠোরভাবে মানবিক বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৯.২ সুপারিশমালা :

১. বিশ্বব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে জিহাদের প্রকৃত অর্থ (আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা ও সমাজ সংস্কার) তুলে ধরতে হবে।
২. চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর অপব্যখ্যা রোধে ওলামা সমাজ এবং গবেষকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া দূর করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (References) :

১. আল-কুরআনুল কারীম (সূরা তাওবাহ, সূরা ফুরকান, সূরা বাকারাহ)।
২. সহীহ আল-বুখারী (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার)।
৩. সহীহ মুসলিম (কিতাবুল জিহাদ)।
৪. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ - ড. ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি।
৫. ইবনে রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়ানিহায়াতুল মুজাসিদ*।
৬. আল-কাসানী, *বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে*।
৭. ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ (ইবনে হিশাম ও ইবনে কাসীর)।